ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪২, ১৪৩১/২০২৪, ৫৭-৭৬
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4204

উপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে মহামারি বিস্তার এবং তা প্রতিরোধে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ও সমস্যা

মো. কবির হাসান
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract: During the colonial era, India experienced numerous outbreaks of infectious diseases including cholera, plague, smallpox, and influenza. These epidemics caused significant alarm among the British colonial authorities and European nations as quarantine protocols for ships posed serious disruptions to trade. Responding to these pressures the British government enacted the Epidemic Diseases Act in 1897, designed to curb the spread of infectious diseases in the Indian subcontinent. The primary focus of the colonial administration through this law was the protection of the European population residing in India. The Act granted extensive powers to medical professionals, Indian Civil Service (ICS) officers, and military personnel, allowing them to enforce strict measures. When contagious diseases spread rapidly through cities like Mumbai, Pune, Kolkata, and Karachi, government-imposed restrictions led to widespread public resentment and unrest. Despite the public's resistance the Epidemic Diseases Act proved instrumental in managing and containing outbreaks.

Key Words: Leishmaniasis, Sanitation, Cholera, Smallpox, Kumbh Mela

ভূমিকা

উপনিবেশিক শাসনের শুরু থেকেই বাণিজ্যের উন্নতি, যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি, নতুন বন্দর এবং শহুরে জীবনের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। শহরগুলিতে সামরিক ক্যাম্প স্থাপন, তীর্থযাত্রা, দারিদ্র্য, জনঘনত্ব এবং উষ্ণ জলবায়ুর কারণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে বন্দর ও শহরগুলি মহামারির কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিল। পূর্ব-আধুনিক যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভাবে মহামারি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নি। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজ নাবিকদের মাধ্যমে ভারতীয় মাটিতে আধুনিক পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে পশ্চিমা চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটে। ১৭৬৪ সালে কোম্পানির সেনাবাহিনী এবং কর্মচারীদের জন্য একটি চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। কয়েক দশক পর কলকাতা, বোম্বে এবং মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিগুলিতে সামরিক এবং নাগরিক চিকিৎসা বিভাগ গঠন করা হয়। উনিশ শতকের শুরুতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমা চিকিৎসা গবেষকরা ভারতীয় চিকিৎসার গুরুত্ব উপলব্ধি করে। এই উদ্দেশ্যে ১৮২২ সালে স্থানীয় বা দেশজ (Native) মেডিকেল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে স্থানীয় চিকিৎসা এবং অনূদিত পশ্চিমা গ্রন্থ

অধ্যয়ন শুরু হয়। এতে স্বদেশীয় ও পশ্চিমা চিকিৎসা জ্ঞানের সংমিশ্রণ ঘটে। তবে দেশী ও পশ্চিমা ভাষা বিরোধের কারণে এ ইনস্টিটিউটের পরিচালনা কার্যক্রম শুরু থেকেই ব্যহত হতে থাকে। ভারতবর্ষে চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়ন ও মহামারি নিয়ন্ত্রণে ১৮৩৫ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৫৯ সালে রয়্যাল কমিশনের ভিত্তিতে স্যানিটারি কমিশন কাজ শুরু করে যা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর স্বাস্থ্য পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য গঠিত হয়েছিল। ১৮৭০ সালে স্যানিটারি বিভাগকে টিকাদান বিভাগের সঙ্গে একীভূত করা হয়। ১৮০২ সালে গুটিবসন্তের টিকা আবিষ্কারের পর একজন সুপারিনটেনডেন্ট জেনারেল অব ভ্যাক্সিনেশন নিযুক্ত করা হয়। টিকাদানের মাধ্যমে গুটিবসন্ত কিছুটা প্রতিরোধ করা সম্ভব হলেও সেই সময়ে ভারতে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া, যক্ষা, কালা-আজার, ইনফ্লুয়েঞ্জা, কুষ্ঠ এবং অন্যান্য রোগগুলোর মহামারি আকারে ছড়ানোর মাত্রা ছিল তীব্র। এসব সংক্রামক রোগ প্রতিরোধের একটি উপায় হিসেবে সরকার আক্রান্ত এলাকার রোগীকে পৃথকভাবে জীবাণুমুক্ত করার চেষ্টা করে। এছাড়া সরকার ঐসব মহামারি রোগ প্রতিরোধে আইন প্রণয়নে আগ্রহী ছিল। যদিও এসব আইনের অধিকাংশই তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ রক্ষা, ইউরোপীয় অঞ্চলগুলোতে রোগের বিস্তার রোধ এবং ভারতে বসবাসরত ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য করা হয়েছিল। তবু একথাও সত্য, স্বাস্থ্য বিষয়ে ভারতবাসী তীব্র অসচেতন ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন থাকায় সরকার সাধারণ চেষ্টার পাশাপাশি কঠোর আইন প্রয়োগ করে মহামারি প্রতিরোধের চেষ্টা করেছিল।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সুনির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আলোচ্য প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। যেমন- ক. উপনিবেশিক ভারতের মহামারির একটি বিস্তৃত চিত্র তুলে ধরা। খ. মহামারি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে উপনিবেশিক সরকারের নীতি ও পদক্ষেপ বিশ্লেষণ করা। গ. উপনিবেশিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং উন্নতির সম্ভাবনা চিহ্নিত করা। ঘ. মহামারি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রতিরোধের কৌশলগুলি তুলে ধরা। ঙ. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমানের স্বাস্থ্য সংকট মোকাবিলায় অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করা।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতয়িক উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভারতবর্ষে উপনিবেশিক আমলের সরকারি নথিপত্র, প্রতিবেদন, গেজেট, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন রিপোর্ট-সমীক্ষা এবং সামসাময়িক পরিসংখ্যান, ঐতিহাসিক গ্রন্থ, জীবনীগ্রন্থ এবং সামসাময়িক পত্র-পত্রিকা ব্যবহার করা হয়েছে। দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে স্বীকৃত গবেষণা গ্রন্থ, সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের তথ্যের সত্যতা বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য প্রবন্ধ রচনায় সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হিসেবে মহামারির সামাজিক প্রভাব, জাতিভেদ প্রথা এবং সামাজিক

কুসংস্কারের ভূমিকা, জনস্বাস্থ্য নীতি এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা প্রশ্ন

কয়েকটি গবেষণা প্রশ্নের আলোকে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। ক. উপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে মহামারি কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং এর প্রধান কারণ কী ছিল? খ. মহামারি প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল এবং সেগুলি কতটা সফল হয়েছিল? গ. উপনিবেশিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলো কী ছিল? ঘ. মহামারি প্রতিরোধে ভারতীয় জনগণের ভূমিকা কেমন ছিল? আলোচ্য প্রবন্ধে উক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর নির্ণয়ের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা সীমাবদ্ধতা

ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসনামলের অনেক নথি এবং তথ্য হারিয়ে গেছে বা সঠিকভাবে সংরক্ষিত নেই। আর সংরক্ষিত তথ্যও সহজলভ্য নয়। স্থানীয় জ্ঞান এবং প্রতিরোধের কৌশলগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ছিল কারণ অনেক তথ্য লিখিত আকারে নেই। এছাড়া সময়ের সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং ভাষাগত সীমাবদ্ধতাও ছিল। এই সীমাবদ্ধতাগুলো বিবেচনা করেই আলোচ্য গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে।

মহামারি

মহামারি (Pandemic) এমন একটি বিস্তৃত রোগব্যাধি যা স্থানীয় এলাকা, দেশ বা মহাদেশ পেরিয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং অগণিত মানুষকে আক্রান্ত করে। এটি সাধারণত এক ধরনের নতুন বা অজানা ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া বা প্যাথোজেনের কারণে ঘটে যার বিরুদ্ধে জনসংখ্যার বড় অংশে প্রাকৃতিক বা অর্জিত প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পায়। মহামারির তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে; নতুন রোগজীবাণু (Novel Pathogen), মানুষের মধ্যে দ্রুত সংক্রমণ (Rapid Human Transmission) এবং বৈশ্বিক বিস্তার (Global Spread)। মহামারি রোগগুলি সাধারণত অন্যান্য সংক্রামক রোগ হতে ভিন্ন হয়ে থাকে। অধিকাংশ মহামারি প্রাকৃতিক একটি চক্রের অংশ হিসেবে আসে আবার চলে যায়। মহামারিকালে আক্রান্ত এলাকার মানুষ প্রতিনিয়ত রোগের সাথে লড়াই করতে থাকে। এক সময় আক্রান্ত এলাকার মানুষের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও তৈরি হতে দেখা যায়। এই কারণেই মহামারি দ্বারা মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হলেও এতে কোনো সভ্যতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি।

উপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে মহামারির কারণ অনুসন্ধান

শুধুমাত্র জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বিরূপ অবস্থা মহামারি সৃষ্টির জন্য দায়ী নয়, মানুষের জীবনযাপন ও আবাসন পদ্ধতিও এর সাথে সম্পর্কিত। জঙ্গল বৃদ্ধি, অস্বাভাবিক ভারী বৃষ্টিপাত এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে পানির সঞ্চয় বৃদ্ধির সাথে মহামারির বিস্তার

সম্পৃক্ত ছিল। ভারতবর্ষের বঙ্গের নিম্নাঞ্চলে কলেরা একটি প্রাণঘাতী রোগ হিসাবে পরিচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আসামের বিভিন্ন এলাকায় এই রোগ ভয়াবহ রূপে দেখা দিয়েছিল। এ সম্পর্কে ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টার বলেছেন, 'In the Kamrup district of Assam, Cholera would appear during the rainy seasons.'[১] যশোরে কলেরা মহামারির কারণ খুঁজে বের করার জন্য গঠিত একটি মেডিকেল বোর্ড তাদের পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করে, 'In the Jassore region, the exreme humidity of weather and the prolonged continous rainfall during the monsoon season led to the outbreak of Cholera.'[২] সিভিল সার্জন কলেরার বিস্তার সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণে উল্লেখ করেন,

> During autumn, the rice crops mature early due to heat and humidity which makes them unusually flavorful. The supply of new rice was abundant, and its price was cheap. Because of its affordability and easy availability poor people consumed rice produced from immature paddy. This excessive consumption of rice became a major cause of the Cholera epidemic.[৩]

রেলপথ নির্মাণ

ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের ফলে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অংশে প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। রেলপথ নির্মাণের আগে দীর্ঘ ও উঁচু রাস্তা কম থাকায় বন্যার সময় পানি প্রবাহ বাধাগ্রস্থ হতো না। বন্যার পানি খোলা মাঠ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রাকৃতিকভাবে নিষ্কাশনের পথ বেছে নিত এবং তা ব-দ্বীপ অঞ্চলের সব অংশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাল ও চ্যানেলের মাধ্যমে বেরিয়ে যেত। রেলপথ নির্মাণের মাধ্যমে বাংলায় বন্যার পানির এই প্রাকৃতিক প্রবাহ প্রক্রিয়া ধ্বংস হয়েছিল। রেলপথ তৈরি করতে বাঁধ এবং রেল স্টেশনে যাত্রী পরিবহনের জন্য পার্শ্ব রাস্তার সংযোগ প্রয়োজন হয়েছিল। বর্ষাকালে নদীর পানি উপচে পড়ার ফলে বন্যার প্রবল আক্রমণ থেকে রেলপথ ও সংযোগ রাস্তাগুলোকে রক্ষা করতে নদীর বাঁধগুলোকে ভেঙে যাওয়া থেকে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। গঙ্গার ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে নদীর পানির সহজ নিষ্কাশন বাধাগ্রস্থ হওয়ার পরপরই ম্যালেরিয়া ও কলেরা মহামারির প্রাদুর্ভাব একসঙ্গে দেখা দেয়।[৪] রেলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ একসাথে যাতায়াত করে। তাদের মধ্যে মহামারি আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে ট্রেনে চলাচলকারী সুস্থ মানুষদের মধ্যে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে পড়তো। শুধু ট্রেনের কামরায় রোগ ছড়াতো তা নয়, মানুষ ট্রেনের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করার ফলে তাদের মাধ্যমে রোগের জীবাণুও বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তো।

পানি সমস্যা ও অপরিকল্পিত নগরায়ন

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের মানুষের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহ ছিল খুবই কম। দূষিত পানি ব্যবহারের কারণে ডায়রিয়া ও

কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটতো। আমাশয় ছিল পূর্ব ভারতে আরেকটি ভয়াবহ রোগ। এসব রোগের বিস্তারের মূল কারণ ছিল পানীয় হিসেবে অপরিশোধিত পানির ব্যবহার। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মানুষ স্থির, নোংরা এবং অনিয়ন্ত্রিত পুকুরের পানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। কিছু এলাকায় জোয়ার-ভাটা প্রভাবিত পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় বিশুদ্ধ মিষ্টি পানি সংগ্রহে কঠিন সমস্যা হতো। সরকারি রেকর্ড থেকে দেখা যায়, ১৮৭১-৭২ সালে বাংলার প্রধান হাসপাতাল ও চিকিৎসালয়ে থাকা ৩,৮৮১ জনের মধ্যে ১,৩০৯ জন ডায়রিয়া ও আমাশয়ে মারা গিয়েছিল।[৫]

বাকেরগঞ্জ, নদীয়া ও ময়মনসিংহ জেলার পানীয় জলের উৎসগুলো ছিল দূষণে ভরা। শুষ্ক মৌসুমে নদী থেকে দূরে বসবাসকারী মানুষ পানির সংকটের মুখোমুখি হতো। এসব অঞ্চলে অনেক পুকুর থাকলেও সেগুলো ছিল নোংরা এবং পরিত্যক্ত। এসব জলাশয় গোসল, কাপড় ধোয়া ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হতো। একই সাথে এসব পুকুরে পচা জলজ উদ্ভিদের উপস্থিতি ছিল পানি দূষণের কারণ। জেলায় কয়েকটি কূপ ছিল কিন্তু এসব কূপের পানি লবণাক্ত পদার্থে ভরপুর থাকায় তা মানব ব্যবহারের উপযোগী ছিল না।

বীরভূমের সিভিল সার্জনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, এ অঞ্চলে অনেক মহামরি রোগের কারণ ছিল অনুপযোগী পানির ব্যবহার। কলেরা রোগীদের মল-মূত্র মাটিতে সম্পূর্ণভাবে শোষিত না হয়ে এ রোগের জীবাণু বৃষ্টির পানিতে ছড়িয়ে পরে জলাশয়গুলোকেও দূষিত করতো। এসব দূষিত পানি ব্যবহারের ফলে এ অঞ্চলে নিয়মিতভাবে মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটতো।[৬]

অপিরিকল্পিত নগরায়ন

করাচি, কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, ঢাকায় নগরায়ণের শুরু থেকেই সঠিক পরিকল্পনার অভাব লক্ষণীয় ছিল। ঔপনিবেশিক শাসকরা এসব শহগুলিতে রাস্তাঘাট নির্মাণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থা, স্যানিটারি ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা এবং নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের মতো অতি প্রয়োজনীয় পৌরসেবা গঠনে যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন না। শহরের গলি ও রাস্তাগুলো জরাজীর্ণ ছিল এবং বর্ষাকালে কাঁদা ও নোংরা পানিতে পূর্ণ হয়ে যেত। কলকাতার স্থানীয় জনগণ শহরের দূষণ সম্পর্কে সচেতন ছিল না। তারা অভ্যস্ত ছিল খোলা ড্রেনের পাশে মল-মূত্র ত্যাগ করতে।[৭] শহরের দুর্বল অবকাঠামো, বাসিন্দাদের অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস এবং নিরাপদ পানীয় জলের অভাবেই এসব শহরে মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল।

মেলা প্রাঙ্গণের অপ্রতুল স্যানিটেশন

ভারতবর্ষের বড় শহর এবং গ্রামগুলোতে প্রতি বছর বিভিন্ন ঋতুতে ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক মেলা হিসেবে হরিদ্বারের কুম্ভমেলা, এলাহাবাদের প্রয়াগের মেলা, পুরীর জগন্নাথধাম, মহারাষ্ট্রের নাসিক ও পান্ধারপুরের তীর্থস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি, তামিলদেশে

কাঞ্চিপুর ছিল অন্যতম। হাজার হাজার মানুষ এই মেলাগুলোতে একত্র হতো যেখানে ন্যূনতম স্যানিটেশন সুবিধার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজশাহী অঞ্চলে অসংখ্য মানুষের উপস্থিতিতে প্রধান মেলাগুলো অনুষ্ঠিত হতো যেমনঃ চৈত্র মাসে মান্দায়, কার্তিক মাসে ক্ষেতুরে, দীপাবলি উপলক্ষে বুদপারায়, দুই সপ্তাহব্যাপী কাশিমবাজারে, রথযাত্রা উপলক্ষে তাহেরপুরে এবং ঈদ উপলক্ষে বাঘায়।[৮]

বুড়া-বুড়ি ছিল বঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ গ্রামদেবতা। কোচবিহার জেলার উচলপুকুরীর মেখলিগঞ্জের ব্যাংকান্দি গ্রামে বুড়া-বুড়ি নামে দেবতার ধারণার উদ্ভব হয়। এখানে প্রতিবছর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজোর সময় বুড়া-বুড়ির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পূজো হতো। এছাড়া সোনারগাঁওয়ের কাছে গোলা-কান্ধায় প্রতি বছর পৌষ মাসে বুড়া-বুড়ির সম্মানে একটি বিখ্যাত মেলা অনুষ্ঠিত হতো যেখানে নমঃশূদ্র (চণ্ডাল) এবং অন্যান্য শূদ্র জাতির ভিড় জমতো। দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য সেখানে পুরুষ ছাগল এবং মহিষ বলি দেওয়া হতো। প্রাণীর রক্ত; মন্দির ও এর চারপাশের গাছের শেকড়, শাখা ও পাতাগুলোকে দুর্গন্ধময় করে তুলতো। ১৮৭৪ সালের বারুনি (Baruni) উৎসবে কলেরা মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল যার ফলে অনেক ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা মেলার স্থান থেকে পালিয়ে যায়। বাকেরগঞ্জ জেলায় প্রতি বছর পাঁচটি প্রধান মেলা অনুষ্ঠিত হতো, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় মেলায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার মানুষ উপস্থিত থাকতো। মেলাগুলোতে স্যানিটেশন সুবিধার অভাবে মহামারি রোগের সৃষ্টি হতো এবং এসব প্রচলিত মেলা থেকে তা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়তো।[৯]

উপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে মহামারি রোগ

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া একটি জলবাহিত রোগ। ভারতবর্ষে রেলপথ নির্মাণের সময় নিষ্কাশন ব্যবস্থা উপেক্ষা করার ফলে বৃষ্টির পানি দীর্ঘদিন জমা হয়ে থাকতো। পরবর্তীতে এই জমে থাকা পানিই ম্যালেরিয়া ছড়ানোর জন্য মশার আবাসস্থল হয়ে উঠতো।[১০] রাজা দিগম্বর মিত্র ১৮৬৩ সালের ম্যালেরিয়া তদন্ত কমিটির প্রথম ভারতীয় সদস্য, যিনি 'রেল বাধ' তত্ত্বের উপর জোর দিয়ে দাবি করেছিলেন, অপরিকল্পিত রেলপথ নির্মাণ ছিল ম্যালেরিয়া মহামারির দ্রুত বৃদ্ধির প্রধান একটি কারণ। তবে খরা চলাকালীন ম্যালেরিয়া তেমন দেখা যেতো না, কারণ খরার ফলে মশার প্রজনন কমে আসতো। ১৮৪০-এর দশকে পাঞ্জাব এলাকার কর্মকর্তারা ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং তা ১৯১৮ সাল পর্যন্ত চলতে থাকে। ভারতবর্ষে ১৯২১ সালে ম্যালেরিয়া তীব্র মহামারি রূপে দেখা দেয় এবং এতে ৭,৩৭,২২৩ জনের মৃত্যু হয়। তবে ১৯২২ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে এর তীব্রতা কিছুটা কমে আসে যেমন, ১৯২৯ সালে ৩,৩৫,৪১৪ জন এবং ১৯৩৮ সালে ৪,১৬,৫২১ জন মৃত্যুবরণ করে। তবে ১৯৪৪ সালের দিকে মৃতের সংখ্যা পুনরায় ৭,৬৩,২২০ জনে পৌঁছায়।[১০] ১৯৫৫ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আহ্বানে চিকিৎসক কার্ত্তিক বসুর নেতৃত্বে ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরির কাজ শুরু হয়।[১১]

গুটি বসন্ত

গুটি বসন্ত ভারতবর্ষে 'বসন্ত রোগ' নামে পরিচিত। গুটি বসন্ত একটি প্রাচীন রোগ। এ রোগের উৎপত্তি হয়েছিল আফ্রিকায়। পরবর্তীতে এটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করেছে। ১৯৭৯ সালে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এই সংক্রামক রোগের দ্বারা বিশ্বব্যাপী ৩০০-৫০০ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছে।[১২] সংক্রামক রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো কোনো নির্দিষ্ট আবহাওয়া এবং মৌসুমে এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পায়; যেমন গুটি বসন্ত বছরের প্রথমার্ধে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়তো। গুটি বসন্তের সংক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল কলকাতা। ১৮৩৮ সালে এখানে মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৮৪৮-৫০ এবং ১৮৫৬-৫৮ সালে এটি মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। ১৯১৯-২০ সালে গুটি বসন্তের পুনরুত্থান ঘটে, যার ফলে ৩৬,১৯০ জনের মৃত্যু হয়। ১৯২৮ সালে মৃত্যের সংখ্যা বেড়ে গিয়ে ৪৩,৫৫৮ জনে পৌঁছায়। ১৯২৯ সালে এর প্রভাব কমে যায়, ফলে মৃত্যুর সংখ্যা ২০,৪০৭ জনে নেমে আসে। তবে ১৯৩৩ সালে গুটি বসন্তের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা আবার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও ১৯৩৫ সালে মৃত্যুহার সর্বনিম্ন হারে পৌঁছায়, যেখানে মৃত্যু হয় ৭,৫৪৮ জনের। কিন্তু ১৯৩৬ সালে হঠাৎ করে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬,২৬৭ জনে পৌঁছে, যা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় সর্বাধিক। গুটি বসন্তের কারণে ভারতবর্ষে এত প্রাণহানির কারণ ছিল এ রোগের টিকাকরণের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। এছাড়া টিকা সরবরাহের অপ্রতুলতা ছিল এর অন্যতম একটি কারণ।[১৩]

ষোল শতকের চিকিৎসা সাহিত্যে শীতলা দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মানুষ বিশ্বাস করতো শীতলা দেবী গুটিবসন্ত রোগ থেকে মুক্তি দিতে পারেন। তাছাড়া হাসপাতালে যাওয়ার অনীহা, সুচ দিয়ে ঔষধ গ্রহণের ভয় এবং ব্রিটিশদের চিকিৎসা পদ্ধতিকে বিদেশি মনে করায় ভারতীয় জনগণ টিকা গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করতো। ফলে উপনিবেশিক সরকারের পক্ষে মহামারি নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

কলেরা

উপনিবেশিক শাসনামলের পূর্বে থেকেই ভারতবর্ষের মানুষ মহামারির সাথে পরিচিত ছিল, তবে ১৮১৭-১৮২১ সালের কলেরা মহামারি পুরো ভারতকে বিধ্বস্ত করেছিল। এই মহামারির আগে কলেরা শুধুমাত্র বাংলায় দেখা দিতো। শিল্প উন্নয়ন, যেমন: পরিবহন ও বাণিজ্যের উন্নয়ন, কলেরা রোগের জীবাণু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। ১৮১৭-১৮২১ সালের মধ্যে কলেরা সামরিক বাহিনী এবং কোম্পানির কর্মকর্তাদেরও আক্রমণ করেছিল, তাই কোম্পানি এ বিষয়ে সতর্ক হয়ে ওঠে। ১৮৬৮ সালের কলেরা মহামারির কারণ অনুসন্ধানের জন্য কলেরা কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কমিটির মতে, কলেরা প্রধানত উৎসবের সময় ছড়িয়ে পড়ে পর্যটক, তীর্থযাত্রী এবং সৈন্যদের মাধ্যমে। সুতরাং সমাধান হিসেবে উক্ত কমিটি ধর্মীয় উৎসব,

কারাগার, শিবির এবং হাসপাতালের জন্য সঠিক স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি প্রদান করার সুপারিশ করে।

এই জলবাহিত রোগটি বাংলার গ্রামীণ অঞ্চলে 'ওলা-উঠা' বা 'বিশুচিকা' নামে পরিচিত। ভারতে মহামারি আকারে কলেরা প্রথম কোথায় দেখা দিয়েছিল তা নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে। যশোর জেলার ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেক্টর জে. ওয়েস্টল্যান্ড রিপোর্ট করেন, '১৮১৭ সালের ২০ আগস্ট যশোরে প্রথম কলেরার ঘটনা ঘটে। তার এক বা দুই দিনের মধ্যেই পুরো যশোর শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। যশোরে কলেরা মহামারি আক্রমণ এবং বিস্তার অত্যন্ত আকস্মিক এবং ভয়াবহ ছিল'।[১৪] সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, কলেরা মহামারি প্রথম ১৮১৭ সালের আগস্ট মাসে যশোরে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ১৮১৭ সালের মার্চ মাসে ফোর্ট উইলিয়ামে কলেরা রোগের খবর পাওয়া যায়। এছাড়াও জানা গেছে, ওই বছরের মে এবং জুন মাসে কৃষ্ণনগর এবং ময়মনসিংহে কলেরা মহামারির আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে জে এইচ ই. গ্যারেট তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, 'Cholera appeared for the first time in India at Nabadwip town under Nadia District.'[১৫] ফ্রেডেরিক করবিন উল্লেখ করেছেন, 'Epidemic Cholera appeared at Krishnagar, Nadia in May, 1817.'[১৬] ভারতে কলেরার উৎপত্তিস্থল নিয়ে তীব্র বিতর্ক থাকা সত্ত্বেও বলা যায়, ১৮১৭ সালে যশোরে কলেরা মহামারির প্রথম তীব্র আক্রমণ ঘটে। ডা. বি ডি. স্মিথের প্রচারিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়েছে, '...10,000 people died of Cholera in two months in the district of Jessore. Since then Jessore acquired a bad reputation for the outbreak of the disease and spreading it up the valley of the Ganges.'[১৭] একটি রেকর্ডে বলা হয়েছে, ১৭৮৩ সালে বাংলায় তীর্থযাত্রার সময় ২০,০০০ জন মানুষ কলেরার কারণে মারা গিয়েছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধে প্রতি বছর ২-৮ লক্ষ মানুষ কলেরার কারণে মারা যেত। ১৯২৩-১৯৩৪ সালের মধ্যে কলেরার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ২৪,৯০,৪০১ জন ছিল, প্রতি বছর যার গড় ছিল ২,০৭,৫৩৩ জন। ডিরোজিও (Derozio) এবং ডেভিড হেয়ার যথাক্রমে ১৮৩১ এবং ১৮৪২ সালে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[১৮] ভারতবর্ষের বাংলা অঞ্চলে কলেরা মহামারি কতটা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল তা নিম্নে আলোচিত অঞ্চলভিত্তিক পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হবে।

যশোর অঞ্চল

যশোর ছিল কলেরা খ্যাতির স্থান, যেখানে ১৮১৭ সালে কলেরার প্রাথমিক মহামারি শুরু হয় এবং পরে এটি গঙ্গা উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর উপস্থিতির দুই মাসের মধ্যে যশোরে কলেরা মহামারি থেকে ১০,০০০ জন মারা যাওয়ার রিপোর্ট করা হয়েছে।[১৯] যশোর জেলায় ১৮৪২-৬৯ সময়কালে প্রায় প্রতিবছরই

কলেরা মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই বছরগুলোতে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বা মৃত্যুর হার সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য ব্রিটিশ নথিপত্রে সংরক্ষণ করা হয় নি। ১৮৬৭ সালে মার্চ-এপ্রিল মাসে যশোর শহরের জেলখানায় মামলাকৃত মোট ২০১ জনের মধ্যে কলেরায় ৫৯ জনের মৃত্যু হয়, ৯৪ জন সুস্থ হয় এবং বাকি ৪৮ জনের ফলাফল অজানা। ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৮৬৯ সালের জানুয়ারির প্রথমার্ধ পর্যন্ত চলমান মহামারিতে শহরের মোট ১৩৯ রিপোর্ট করা মামলাকৃত ব্যক্তির মধ্যে কলেরায় ৮৪ জন মারা যায় এবং ৫৫ জন সুস্থ হয় ।[২০]

যশোর জেলার চিকিৎসা রেকর্ডগুলি থেকে জানা যায়, ১৮৮০ সাল থেকে যশোর প্রতি বছরই কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছে। ১৮৮২ সালে কলেরা মহামারি ঝিনাইদহ এবং কোটচাঁদপুর থানা এলাকায় বিস্তার লাভ করে, যেখানে মৃত্যুহার ছিল যথাক্রমে প্রতি হাজারে ১৭.৪৭ এবং ১১.৯২। ১৮৮৩ সালে কলেরা মহামারি বাঙ্গাঁও, গাইঘাটা এবং গারাপোটা থানার বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক আক্রমণ করে, যেখানে মৃত্যুহার যথাক্রমে ১০.৪৭, ৭.৩০ এবং ৬.৫৫ ছিল। ১৮৮৫ সালে মহামারি আবারও বাঙ্গাঁও, গারাপোটা এবং গাইঘাটা থানা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তখন বাঙ্গাঁও থানায় কলেরার মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ১৩.১৩ অন্যদিকে গারাপোটা এবং গাইঘাটায় যথাক্রমে ৭.৪৮ এবং ৫.৪৫ ছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে যশোরের ৬০,০০০ মানুষ কলেরার কারণে প্রাণ হারিয়েছে।[২১]

হুগলি

উনিশ শতকে অন্যান্য জেলার মতো কলেরা হুগলিতে ছড়িয়ে পড়ে। জেলার সিভিল সার্জন ডা. রস ১৮৫৩ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, হুগলিতে তার পাঁচ বছরের অবস্থানে কলেরা প্রতি বছর এখানে ভয়াবহভাবে আক্রমণ করেছিল। তিনি রিপোর্টে আরো উল্লেখ করেন, অতি নিম্নমানের স্যানিটেশন ব্যবস্থার কারণে হুগলিতে কলেরা মারাত্বকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। হুগলিতে স্যানিটারি কমিশনারের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৮৭১ সালে হুগলিতে কলেরায় ৬২১ জন মৃত্যুবরণ করে। ১৮৭২ সালে এ সংখ্যা বেড়ে ৬৪৯ জনে পৌঁছায়। ১৮৭৯-১৮৮৮ পর্যন্ত সময়কালে হুগলিতে কলেরা মহামারিতে মোট ১২,৫২৮ জন মৃত্যুবরণ করে, এরমধ্যে ১৮৭৯ সালে ৪৫৯ জন; ১৮৮০ সালে ৭৫৪ জন; ১৮৮১ সালে ১,৪১৬ জন; ১৮৮২ সালে ১,৪৭৩ জন; ১৮৮৩ সালে ১,৩৫২ জন; ১৮৮৪ সালে ১,৩৮০ জন; ১৮৮৫ সালে ১,৭৩৮ জন; ১৮৮৬ সালে ১,৪০৩ জন; ১৮৮৭ সালে ৯৩৩ জন; ১৮৮৮ সালে ১৬২০ জন মৃত্যুবরণ করে।[২২] পরবর্তীতে ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৮ সময়কালে হুগলিতে কলেরায় মোট ১৮,৫৯৭ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যা আগের দশকের তুলনায় প্রায় ৩৫% বেশী। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে হুগলি জেলার কলেরার প্রাদুর্ভাবের মাসিক মৃত্যুর তথ্যের পরিসংখ্যান উপস্থাপন হলো:[২৩]

সারণি ১

বছর ও মৃতের সংখ্যা

মাস	১৮৮৯	১৮৯০	৮৯১	১৮৯২	১৮৯৩	১৮৯৪	১৮৯৫	১৮৯৬	১৮৯৭	১৮৯৮	মোট
জানুয়ারি	৮১	১৪৫	১২৫	৪৮	৬৮	১৫০	৩৫০	১৮৯	১০২	১৮	১২৭৬
ফেব্রুয়ারি	৬৭	৯৪	২৯০	৯০	৩৬	৩৩৮	১৮৪	২৬৮	১২৫	৫৩	১৫৪৫
মার্চ	৬৪	৭৯	৪০৮	৪৩৯	৩২	২৬১	১৯৬	১১৫০	৪২৯	৮৪	৩১৪২
এপ্রিল	১২৮	১৭৪	২৪১	১১২১	৩০	১৬৩	৬২৭	১৩২৭	৩৮৮	১০২	৪৩০১
মে	৪৬	৪৯	৩৪	৭১৫	৭৯	৭০	১৩৩	৬৫১	১০৫	৬৯	১৯৫১
জুন	৫৭	১২	৩১	২৬০	৪৪	৫৯	২৫	৩২৬	৭৬	১৬	৯০৬
জুলাই	৮৩	৩২	২৩	৩১০	৩১	১৬৭	১০৩	১৩৮	৩৮	৪৩	৯৬৮
আগস্ট	৫৫	১১	২৩	১২৪	২৮	১৮৪	৪৯	৪৪	২৪	৩৭	৫৭৯
সেপ্টেম্বর	৫৬	৬	৫২	১৬	৪৪	৭৪	৮৮	২৮	১১	৮	৩৮৩
অক্টোবর	৯৬	৪	২৩৫	৩১	১৮৯	৩৭	৯৫	১৩	৪১	১	৭৪২
নভেম্বর	১৯৯	৮	২০২	১০২	১৭৩	৮৩	১০৩	৬	১১৭	০	৯৯৩
ডিসেম্বর	৩১৪	১৫১	২৩২	১৫৯	১৮২	২৭৩	৩৩৯	৩৭	১১৭	৭	১৮১১
মোট	১২৪৬	৭৬৫	১৮৯৬	৩৪১৫	৯৩৬	১৮৫৯	২২৯২	৪১৭৭	১৫৭৩	৪৩৮	১৮৫৯৭

সূত্রঃ *Hughli Medical Gazetteer 1903*, p.474

আসাম, লক্ষ্মীপুর

ঊনিশ শতকে কলেরা, আসামের প্রধান মহামারি রোগগুলোর একটি হয়ে উঠেছিল। সাধারণত মনে করা হয়, আসামে কলেরার প্রাদুর্ভাবের উৎস ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদল; যারা তাদের সঙ্গে এই রোগটি নিয়ে এসেছিল। ১৮২৫ সালে এই রোগটি দ্বারা সেবাকর্মীদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। ১৮৩৩ ও ১৮৩৫ সালে এ অঞ্চলে রোগটি পুনরায় দেখা যায়। দরং ছিল আসামের অন্যতম কলেরাপ্রবণ অঞ্চল। ১৮৬৫ সালে এ অঞ্চলে প্রায় চার শতাংশ জনসংখ্যা কলেরায় মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে হান্টারের পর্যবেক্ষণে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি ছিল। এ অঞ্চলে ১৮৭০ সালে মহামারি কলেরা প্রতি হাজারে প্রায় আটজনের মৃত্যুর কারণ হয়। ১৮৭০ সালে তেজপুর শহরের পুলিশ কর্মীরাও কলেরার কারণে গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে কলেরা আবার দরং-এ উপস্থিত হয়। ১৮৭৮, ১৮৮৬, ১৮৮৯, ১৮৯১, ১৮৯২, ১৮৯৫ এবং ১৯০০ সালে দরং অঞ্চলে কলেরার উচ্চ মৃত্যুহার রেকর্ড করা হয়েছে। ওই বছরে শতকরা মৃত্যুহার ছিল প্রতি মাইলে ৬ জনের উপরে। তবে উল্লিখিত সালগুলোর মধ্যে ১৮৭৮, ১৮৮৯, ১৮৯১ এবং ১৯০০ সালে মৃত্যুহার তুলনামূলক বেশি ছিল। ওই বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কলেরার শতকরা মৃত্যুহার ছিল প্রতি মাইলে যথাক্রমে ১৭.৬, ৯.০, ১১.৯ ও ৯.৬ জন।[২৪]

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ এলাকায় ১৮১৭ এবং ১৮১৮ সালে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, ঐ দুই বছরে কলেরার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১০,৭১৪ জন। ১৮১৭ সালে এই রোগ মূলত নিম্ন শ্রেণির মধ্যে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ১৮১৮ সালে এই রোগ জাত, ধর্ম, বয়স এবং লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলকে আক্রমণ করেছিল। নিম্নে ১৮৭১ থেকে ১৮৮১ সালের মধ্যে ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলের মৃত্যু হারের চিত্র উপস্থাপন করা হলো।[২৫]

সারণি ২

জেলা	বছর ও মৃত্যুসংখ্যা										
	১৮৭১	১৮৭২	১৮৭৩	১৮৭৪	১৮৭৫	১৮৭৬	১৮৭৭	১৮৭৮	১৮৭৯	১৮৮০	১৮৮১	মোট
ঢাকা	৪২৭	৭৭০	১৮৬৯	৩৯২	৫৭১	৯৭৭	৭৯২৭	৩৪০৯	৪০৬১	১৩৩৯	৩২১৩	২৪৯৫৫
বাকেরগঞ্জ	২৮৮	১০৮০	২৭৩৬	৯১	১৭৭	৪১৫	১৯১৭৭	২৬১০	৪২৯৩	৯৬৫	১৬০৬	৩৩৪৩৮
ফরিদপুর	৫১৯	৪২৯	৩০৩০	১৬২	৮৫	৭২৩	৪০৭০	২৪৫৯	৪৪৫৭	৯২৪	২১৮০	১৯০৩৮
ময়মনসিংহ	২৫৫	৮৮১	১৫০৮	২০৮	৪০৪	৯৪৭	৭৯৭৯	২৬২৮	২৫০৪	৬৫৯	৮৩৯	১৮৮১২
মোট	১৪৮৯	৩১৬০	৯১৪৩	৮৫৩	১২৩৭	৩০৬২	৩৯১৫৩	১১১০৬	১৫৩১৫	৩৮৩৮	৭৮৩৮	৯৩৪৫৭

সূত্র: *The History of Cholera in India from 1862 to 1881: Being a Descriptive and Statistical Account of the Disease*, 1885, p.199.

কলকাতা

কলেরার বিস্তার কলকাতা শহরেও হয়েছিল। ১৮৪০ সালের ২১ মার্চ প্রকাশিত *সমাচার দর্পণে* কলকাতা ও এর আশেপাশে কলেরায় মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। একই সংখ্যায় পুলিশের প্রতিবেদনে ১৮৩৮ সালে কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাবে ৩,৮২০ জনের মৃত্যুর সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছিল, যার মধ্যে ১৮৩৮ সালের জানুয়ারি মাসে মৃত্যের সংখ্যা ছিল ৭৬ জন; ফেব্রুয়ারিতে ১১০ জন; মার্চে ৮৮৩ জন; এপ্রিলে ১৩৯৭ জন; মে মাসে ৭১৮ জন; জুনে ১৩৫ জন; জুলাইয়ে ৫৪ জন; আগস্টে ৫ জন; সেপ্টেম্বরে ১৬১ জন; অক্টোবরে ৫৫ জন জন; নভেম্বরে ৭৬ জন; ডিসেম্বরে ১৫০ জন।[২৬]

কালা-আজার

উপনিবেশিক শাসনামলে ভারতবর্ষে আরেকটি সংক্রামক রোগ ছিল কালা-আজার, যা ১৮৯৮ সালে আসামে উদ্ভূত হয়। কালা-আজারকে ইংরেজিতে লিশম্যানিয়াসিস (Leishmaniasis) রোগ বলা হয়। লিশম্যানিয়াসিস এককোষী নিউক্লিয়াস ধারণকারী প্রোটোজোয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। লিশম্যানিয়াসিসের তিনটি প্রধান প্রকার রয়েছে: কিউটেনিয়াস, মুকোসাল এবং ভিসেরাল। ভিসেরাল লিশম্যানিয়াসিস ভারতে কালা-আজার নামে পরিচিত (কালা মানে কালো; আজার মানে জ্বর)। কালা-আজার মূলত

উষ্ণ অঞ্চলের একটি রোগ। কালা-আজারের উপসর্গগুলো ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ, তবে জ্বরের সময়সীমা সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

১৮২৪-২৫ সালে যশোরে এ ধরনের জ্বরের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা কালা-আজার জটিলতার সাথে মিল ছিল। যশোর জেলার প্রথম প্রাদুর্ভাবের পর ১৮৩২ সালের পর ধীরে ধীরে নদীয়া, চব্বিশ পরগনা, ঢাকা ও হুগলিসহ অন্যান্য জেলাসমূহে মহামারি দেখা দিতে থাকে। ১৯২৫ সালে কালা-আজারের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৬,৭৬৬; ১৯৩৩ সালে ১৩,৪৪৭ জনের মৃত্যুসহ মৃত্যুর প্রবণতা স্থিরভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৩৮ সালে মৃত্যুর সংখ্যা ২১,৬৪২ জনে পৌঁছায়। মৃতের সংখ্যা ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২৭] কালা-আজার রোগীদের চিকিৎসার জন্য মাত্র কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন, যারা চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসতেন যার ফলে শহরের হাসপাতালগুলোতে ভিড় বেড়ে যেত। গ্রামীণ এলাকায় রক্ত পরীক্ষা করার সুবিধা অপর্যাপ্ত থাকায় চিকিৎসকদের তাৎক্ষণিকভাবে রোগ নির্ণয়ে সমস্যা হতো। এতে রোগভোগের সময়কাল বিপজ্জনকভাবে দীর্ঘ হয়ে যেত।

যক্ষা

যক্ষা রোগকে ইংরেজিতে টিউবারকিউলোসিস (Tuberculosis) বলে। এটি এক ধরনের সংক্রামক রোগ যা মাইকোব্যাক্টেরিয়াম টিউবারকিউলোসিস (Mycobacterium Tuberculosis) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট হয়, যার অদৃশ্য কণা মানবদেহে শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে প্রবেশ করে সংক্রমণ ঘটায়। এটি ব্রিটিশ ভারতের জন্য একটি প্রধান স্বাস্থ্য সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এটি কলেরা বা গুটি বসন্তের চেয়ে বেশি তীব্র ছিল। ভারতে যক্ষা প্রধানত প্রোটিনের অভাবের কারণে ঘটেছিল। অপর্যাপ্ত প্রোটিনযুক্ত খাদ্য, অতিরিক্ত মিষ্টি, চর্বি এবং স্টার্চের কারণে মানুষের জীবনীশক্তি হ্রাস পেত, ফলে তারা দ্রুত টিউবারকুল ব্যাকটেরিয়ায় আক্রান্ত হতো। এছাড়া অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ও প্রথা, দারিদ্র্য, খারাপ আবাসন পরিস্থিতি এবং ভিড় এই রোগের বিস্তারে সাহায্য করেছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যক্ষার গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়, যা সরকারি নথি এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতিফলিত হয়। স্যার ডেভিড এজরা ১৯৩৯ সালের ২৩ মার্চ অনুষ্ঠিত টিউবারকিউলোসিস অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের ১০ম বার্ষিক সাধারণ সভায় তাঁর সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করেন, 'Tuberculosis alone killed nearly one lakh of people in Bengal every year. On a very modest computation, ten lakhs of people suffered from this infectious disease.'[২৮]

কুষ্ঠরোগ

ভারতবর্ষে কুষ্ঠ রোগ ছিল একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা। দারিদ্র্য, অতিরিক্ত জনসংখ্যাসহ অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব কুষ্ঠের

মতো সংক্রামক রোগের বিস্তারে অবদান রেখেছিল। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা মনে করতেন, আধুনিক শিল্পায়ন এবং উন্নত যোগাযোগের কারণে দেশের কিছু অঞ্চলে কুষ্ঠ রোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিল্প শ্রমিকরা যখন তাদের নিজস্ব স্থান থেকে শিল্পাঞ্চলে অভিবাসন করতো সেখানে, রোগে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের স্থানে যখন ফিরে আসতো, তখন সেখানে কুষ্ঠ রোগ ছড়াতে শুরু করতো।

১৯২১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে ১,০২,৫১৩ জন কুষ্ঠ রোগী ছিল, যার মধ্যে বাংলা অঞ্চলে প্রতি মিলিয়নে ছিল ৪৮ জন। ১৯৩১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলায় ২১,০০০ জন কুষ্ঠ রোগী ছিল। ভারতে কুষ্ঠ রোগ সংক্রান্ত বেশিরভাগ গবেষণা কাজ ট্রপিক্যাল মেডিসিন স্কুলে সম্পন্ন হয়েছিল। এই গবেষণার ফলে ডাক্তারগণ রোগটি অনেক আগে থেকেই শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। সরকারের পক্ষ থেকে এই রোগ নির্মূল বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সংগঠিত প্রচেষ্টা করা হয়নি। কুষ্ঠ বিরোধী কাজ মূলত সরকার দ্বারা সহায়তাপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। তবে তাদের পক্ষে সরকারের কাজের দায়িত্ব নেওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল।[২৯]

প্লেগ

প্লেগ হংকং থেকে ভারতে এসে এটি প্রায় সমগ্র ভারতকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। ১৮১২ সালে কচ্ছতে প্লেগ ছড়াতে শুরু করে, যা গুজরাট এবং সিন্ধে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্লেগ মহামারি প্রায় দশ বছর ধরে চলেছিল। ১৮২৮ এবং ১৯২৯ সালে পাঞ্জাবের হিসার জেলায়ও প্লেগ দেখা যায়। ১৮৩৬ সালে মারওয়ারেও প্লেগের সংক্রমণ ঘটে, তবে এসব ঘটনা আনুষ্ঠানিকভাবে রেকর্ড হয় নি। ১৮৯৬ সালে প্রথম আনুষ্ঠানিক রেকর্ড হল বুবোনিক প্লেগের, যা বোম্বাইয়ে রেকর্ড করা হয়। বোম্বাই থেকে এটি এক বছরের মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা, মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৮ সালে প্লেগ কলকাতায় বিস্তার লাভ করে এবং ১৮৯৯ সালের মধ্যে সমগ্র ভারতে প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি রেকর্ড অনুযায়ী, ১৯০৩ সালের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ এই প্লেগ মহামারিতে মারা যায়।[৩০] ১৮৯৬ সালে এই বিপজ্জনক রোগ নিয়ন্ত্রণে একটি প্লেগ কমিশন গঠন করা হয়। তৎকালীন প্লেগ স্যানিটাইজেশন কমিশনার লেমাসো লিখছেন, 'প্লেগ ১৯১৭ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অনেক মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছিল এবং আমদানি করা শস্যগুলো এই ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল, কারণ এই শস্যগুলো সংক্রামিত ছিল, অর্থাৎ আমদানিকৃত খামারজাত শস্য থেকে ইঁদুরের মাধ্যমে এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল শহরাঞ্চলে'। এছাড়া প্লেগের উপস্থিতির পিছনে বেশ কয়েকটি কারণ ছিল, যেমন; বাড়িগুলোতে অতিরিক্ত ভিড়, অন্ধকার ছোট ঘর, হাসপাতালে যাওয়ায় মানুষের অনিচ্ছা।[৩১]

উপনিবেশিক ভারতে মহামারি প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ

১৬৭৯ সালে ভারতের প্রথম হাসপাতাল মাদ্রাজে খোলা হয়, যা মাদ্রাজ জেনারেল হাসপাতাল নামে পরিচিত। ব্রিটিশরা ১৮০০ থেকে ১৮২০ সালের মধ্যে মাদ্রাজে চারটি হাসপাতাল খোলে।[৩২] এর পাশাপাশি ১৭৯৬ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালও খোলা হয়। ১৮৫৪ সালের পর সরকার ভারতের অন্যান্য ছোট ঔষধালয় এবং হাসপাতালে ওষুধ বিতরণ করতে শুরু করে।[৩৩] ১৯৩০ সালে কলকাতায় অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ উদ্বোধন করা হয়। ১৯০২ সালে ভারতের প্রায় ৩৩০ বর্গ মাইল পরপর একটি হাসপাতাল কার্যকর ছিল।[৩৪]

১৮৮১ সালের জনগণনা থেকে ব্রিটিশ সরকার মৃত্যু রেকর্ড ও মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে। বিশাল ভারতে মহামারি প্রতিরোধের জন্য ব্রিটিশদের যথেষ্ট পরিকাঠামো ছিল না। উনিশ শতকের শেষদিকে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে মৃত্যুহার কমানো সম্ভব। ১৮৯৬ সালে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটলে বোম্বে সরকার সমুদ্র ও স্থল কোয়ারেন্টাইন উভয়ই কার্যকর করে। বোম্বের প্লেগ কমিটি স্থল ও রেল কোয়ারেন্টাইনকে অধিক গুরুত্ব দেয়। ১৮৬৪ সালের মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টস অ্যাক্ট স্যানিট্যারি পুলিশ গঠন করে। এই পুলিশের কাজ ছিল সামরিক ক্যাম্পগুলোর স্বাস্থ্য অবস্থা নজরদারি করা এবং সেনাবাহিনীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত করা। এই আইনে সাধারণ নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সিভিল বোর্ড গঠন করা হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৭৯ সালের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশে স্বাস্থ্য বিভাগ গঠন করা হয়। কেন্দ্রীয় প্রদেশে স্যানিট্যারী ইঞ্জিনিয়ারও নিয়োগ করা হয়, তবে অর্থের অভাবে তারা প্রথমে স্বাস্থ্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারছিল না। এই সময়ে আন্তর্জাতিক স্যানিটারি সম্মেলনের ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা ভারতের প্লেগের বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ মহামারি নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। ফলে ১৮৯৮ এবং ১৯১২ সালে বোম্বাই এবং কলকাতায় স্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য ট্রাস্ট গঠন করা হয়, যা দিয়ে গরিবদের জন্য বস্তিতে বাড়ি নির্মাণ করেছিল, কিন্তু ভাড়া এত উচ্চ ছিল যে, বস্তিতে থাকা মানুষরা অন্য বস্তিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। সরকার বস্তিগুলো পরিষ্কার এবং শহরগুলোকে সুন্দর করার দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। গরিব মানুষেরা আর্থিক অনটনের কারণে ভিড় করা এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া মহামারি নিয়ন্ত্রণে ১৮৯৬ সালের অক্টোবরে একটি বিজ্ঞপ্তিতে পৌরসভার ক্ষমতা বিশেষভাবে বাড়ানো হয়।

মহামারি প্রতিরোধে পৌর আইন ১৮৮৮ ও মহামারি আইন ১৮৯৭

১৮৮৮ সালে মহামারি প্রতিরোধে পৌর আইন পাশ করা হয়। এ আইনের ক্ষমতাবলে পৌর এলাকায় মহামারিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আলাদা করে হাসপাতালে ভর্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় । তবে পরিবার থেকে আলাদা করে চিকিৎসা প্রদানে, আক্রান্ত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজন তীব্র বাধা দিতো। বোম্বের পৌর কমিশনার পি. সি. এইচ. স্নো ১৮৯৬ সালের ৬ অক্টোবর ঘোষণা করেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্লেগে আক্রান্ত হন, তাহলে তাকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করা হবে। এছাড়া আক্রান্ত রোগীকে তার

আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে দেওয়া হবে না।[৩৫] লর্ড এলগিন মহামারি প্রতিরোধের জন্য ১৮৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাজকীয় ঘোষণা জারি করেন। ভারত সরকার ১৮৯৭ সালে মহামারি রোগ আইন পাস করে। মহামারি রোগ বিলটি ১৮৮৯ সালের ২৮ জানুয়ারি কাউন্সিল সদস্য জন উডবার্ন দ্বারা উত্থাপন করা হয়। বিলটি জেমস ওয়েস্টল্যান্ডের নেতৃত্বাধীন একটি নির্বাচিত কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটি ১৮৯৭ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি তার রিপোর্ট জমা দেয় এবং একই দিনে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর বিলটি পাস হয়।[৩৬] ভারতীয় আইনসভায় মহামারি রোগ আইনের আলোচনার সময় ভারতীয় কাউন্সিলের সদস্যরা বিলটির প্রতি তাদের সমর্থন প্রকাশ করে বলেন, ভারতীয় জনগণ রোগ প্রতিরোধের স্বার্থে আইনটি গ্রহণ করবে।

মহামারি আইনের ১৮৯৭-এর ধারাগুলি হলো[৩৭]

ধারা ১: এই ধারাটি আইনের শিরোনাম এবং ব্যাপ্তি ব্যাখ্যা করে।

ধারা ২: এই ধারায় রাজ্য সরকারকে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

ধারা ২ক: এই ধারায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হয়। এছাড়া ভারত বা এর কোনো অংশে কোনো মারাত্মক সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা থাকলে কোনো জাহাজ বা নৌকা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি অধ্যাদেশ পাস করার অধিকার দেওয়া হয়।

ধারা ৩: এই ধারায় বলা হয়, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের যে কোনো নির্দেশ বা বিধির বিরুদ্ধে গিয়ে কেউ কোনো কাজ করলে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর ধারা ১৮৮ অনুসারে শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ধারা ৪: এই ধারাটি সরকারি কর্মকর্তাদের সুরক্ষার কথা উল্লেখ করে। অর্থাৎ সরকারি যেসব কর্মকর্তা, যারা এই আইন অনুযায়ী সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করছেন; তাদের বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

বলা হয়, ভারতে মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটলে এই আইনটি কার্যকর হবে। ভারতে ভাইসরয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন। এছাড়া চিকিৎসক এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও স্থানগুলোতে পরিদর্শন করার অধিকার ছিল, যা থেকে তারা জাহাজ এবং রেলপথ থেকে কোনো ব্যক্তিকে আটক করার নির্দেশ দিতে পারতেন। এটি স্থানীয় মানুষের মধ্যে উদ্বেগ এবং দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সরকার সঠিকভাবে মহামারি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

মহামারি আইন ১৮৯৭-এর প্রয়োগ

এই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে মহামারির বিস্তার রোধে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাতে এটি অন্য প্রদেশ বা দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে না পড়ে। প্রাদেশিক সরকারকে মহামারি প্রতিরোধে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধির দায়িত্ব পৌর

কাউন্সিলের পরিবর্তে ইউরোপীয় চিকিৎসক এবং সিভিল সার্ভেন্টদের উপর ন্যস্ত করা হয়। সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনার জন্য দেশব্যাপী সেনাবাহিনী এবং আইসিএস (ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস) মোতায়েন করা হয়। ঔপনিবেশিক সরকার ভারতজুড়ে চারটি ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে, যথা: মক্কায় তীর্থযাত্রা নিষিদ্ধ করা, বিশেষ করে সংক্রমিত এলাকা থেকে অভিবাসন নিষিদ্ধ করা, ধর্মীয় জমায়েত রোধে ট্রেনের টিকেট বুকিং বন্ধ করা এবং বোম্বাইয়ের প্লেগ আক্রান্ত এলাকা থেকে সকল প্রকার পণ্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা।[৩৮] এই সময়ে অনেক ইউরোপীয় দেশ ভারত থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করে। জার্মানি, আমেরিকা, পেরু এবং দক্ষিণ চীনসহ অন্যান্য দেশ ভারত থেকে আসা জাহাজের জন্য কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

মহামারি প্রতিরোধে উপনিবেশিক সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের সমস্যা

১৮৬০ সালে পাশ্চাত্যের দেশগুলি জীবাণু নিয়ে তাদের গবেষণা প্রকাশ করতে থাকলে ব্রিটিশরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। এছাড়া তারা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দূষণ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার গুরুত্ব সম্বন্ধে সতর্ক হয়ে উঠে। সরকারি উচ্চ পদাধিকারীরা পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি মাথায় রেখে সাধারণ জনগণের সাথে দূরত্ব তৈরি করে। মেলা বা জনসমাগমে এ উদ্দেশ্যে বাঁশের বেড়া এবং শৌচালয়ের ব্যবস্থা করা হয়। বাংলায় ১৮৬৭ সালে ইউরোপীয় চিকিৎসার ক্লিনিক ছিল ৬১টি। ১৯০০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ৫০০ তে গিয়ে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে পরিষ্কার পরিছন্নতার বিষয়টি মানুষ গ্রহণ করতে শুরু করে। ১৮৯১ সালে হার্ডসন্স সাবানের বিজ্ঞাপন এবং ব্যবহারের উপকারিতা সম্পর্কে বোঝানো হয়। জীবাণু, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া জাতি, ধর্ম, বর্ণ, উচু, নিচু ধর্মীয় পরিচয়ের সাথে কোনরূপ সম্পর্কিত নয়। এক মাত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই স্বাস্থ্য বিধি মেনে চললেই তার নির্মূল সম্ভব বলে প্রচার করা হয়।[৩৯]

লক্ষণীয় যে, ভারত উপমহাদেশের মানুষ কখনো জনস্বাস্থ্য বিষয়ে আধুনিক ধারণা সহজে গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। ব্রিটিশদের আগমনের পূর্বে মড়ক বা রোগ ব্যাধির বিষয়টিকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা এবং ধর্মীয় দৃষ্টি ভঙ্গিতে দেখা হতো। কৌটিল্য তাঁর *অর্থশাস্ত্রে* পাঁচটি দৈব দুর্বিপাকের কথা বলেছেন – অগ্নিকাণ্ড, বন্যা, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও মড়ক; যাকে তিনি রাজা ও রাজ্য বিনাশকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন ভারতবর্ষে ধর্মের অপব্যাখ্যা ও গুজবের সামাজিক একটি অবস্থান ছিল। মূলত এসব গুজবে প্রভাবিত হয়েছে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া এবং নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষ। তারা আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নিজেদের অবস্থানকে যুক্তিগ্রাহ্য করার চেষ্টা করে। সাবলটার্ন ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন– ধর্ম বিশ্বাস এবং আচারে গ্রাম বাংলায় গোষ্ঠীগত মনোভাবের যে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছিল, তা সরকারের মহামারি মোকাবিলা বা সংক্রমণ প্রতিরোধে নেতিবাচক ভূমিকা রেখেছিল, কারণ লোকবিশ্বাস, অলৌকিকতা ও নানান সংস্কার নিম্নবর্গকে গুজবে বিশ্বাসী করে তুলেছিল। ডেভিড আর্নল্ড বলেন, "The colonial measures taken to combat epidemics were often insensitive to local

cultures and customs, provoking widespread resentment".[৪০] এছাড়াও ওয়ারেন হেস্টিংসের সেনাবাহিনী বুন্দেলখণ্ডে কলেরা দ্বারা আক্রান্ত হলে গুজব ছড়ানো হয় যে, জনৈক ব্রাহ্মণের নির্দেশ উপেক্ষা করে রাজা হরদুলকনের স্মৃতিময় স্থানে গো-মাংস খাওয়ার ফলে তারা কলেরাতে আক্রান্ত হয়। ১৮৯৬ সালের বোম্বে প্লেগের সময় জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমনঃ জাহাজের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা, রেলপথে চিকিৎসার ব্যবস্থা, যাত্রীদের জন্য পর্যবেক্ষণ ও আটক কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা। এছাড়া কর্তৃপক্ষ রোগীর বাড়ি জীবাণুমুক্ত করতো, পোশাক পুড়িয়ে ফেলতো, রোগীদের হাসপাতালে পাঠাতো এবং মৃতদেহগুলোকে সৎকার করত। বোম্বাই ফেরত যাত্রীদের পরীক্ষা করা হতো। তবে এই জোরপূর্বক আটক এবং শারীরিক পরীক্ষা স্থানীয় সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায় নি। পরিবার সদস্যরা তাদের মা, বোন, কন্যা বা স্ত্রীদের হাসপাতাল যাওয়ার বিষয়ে সম্মতি দিতে চাইত না। বাল গঙ্গাধর তিলক বোম্বাইয়ের একজন জাতীয়তাবাদী নেতা তিনি প্লেগ প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকারের কাজের কঠোর সমালোচনা করেন। কলকাতার কিছু সংবাদপত্রও মহামারি আইনের সমালোচনা করে। ব্রিটিশ সরকার বাংলায় টিকা দিতে শুরু করলে তা নিয়ে গুজব ছড়ানো হয়। বলা হয়, টিকা নিলে মৃত্যু ঘটবে। এমনকি কোয়ারেন্টাইন ব্যাপারটাকেও মানতে চায়নি সাধারণ জনগণ। একপর্যায়ে সরকারের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ শুরু হলে পুনের প্লেগ কমিশনার মি. র‍্যান্ডকে ১৮৯৬ সালে বিক্ষুব্ধরা হত্যা করে।[৪১] মানুষ মহামারিতে মরতে চেয়েছিল এমনটি নয়। মানুষ চিকিৎসা কেন্দ্রে যাওয়ার পরিবর্তে শরণাপন্ন হয়েছে শীতলা দেবী, ওলা বিবির কাছে। ফলে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তো ব্যক্তি থেকে গোষ্ঠীতে, গোষ্ঠী থেকে সমাজে এবং সমাজ থেকে সর্বত্র।

উপসংহার

ভারতবর্ষের তীব্র মহামারির ভয়াবহতা সম্পর্কে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকার ও ইউরোপীয় দেশগুলো বেশ উদ্বিগ্ন ছিল। উদ্বেগ থেকেই আন্তর্জাতিকভাবে ব্রিটিশ সরকারকে মহামারি নিয়ন্ত্রণের জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়। আন্তজার্তিক চাপ মোকাবেলা ও অসুস্থ অবস্থায় ভারতবাসীকে নিয়ন্ত্রণের জন্য উপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষে মহামারি রোগ আইন ১৮৯৭ পাশ করে। ঔপনিবেশিক সরকারের মহামারি রোধের সদিচ্ছা অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণিত, তবে এসব জনমুখী সদিচ্ছার পেছনে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা করে মুনাফা অর্জন এবং এ উদ্দেশ্যে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও ক্ষমতাশালী অনুগত শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করা। ফলে তাদের গৃহীত নীতিগুলোতে দ্বিচারিতা লক্ষ করা যায়। সরকারের প্রথম দায়িত্বই ছিল ভারতবর্ষে চাকুরিরত ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের এখানকার 'দূষিত' আবহাওয়া ও জায়গা থেকে যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখা। ব্রিটিশদের ধারণা ছিল, তাদের অধিকৃত অঞ্চলগুলো খোলামেলা হবে, অফিসারদের বাংলো হবে আলোবাতাস ভরা, সড়ক, নালা ইত্যাদি হবে স্বাস্থ্যকর। ১৮৬৪ সালে মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টস্ অ্যাক্ট রচিতই হয়েছিল এসব উদ্দেশ্যে। ১৯০৯

সালে *ক্যান্টনমেন্টস্ ম্যানুয়াল*-এ লেখা হয়, এ কথা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ক্যান্টনমেন্টগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য ব্রিটিশ সৈন্যের স্বাস্থ্যরক্ষা, অন্য সবকিছুরই স্থান তার নিচে। এই নীতি অনুসারে জন্ম হল ভারতের নানান শহরে ক্যান্টনমেন্ট, সিভিল লাইন, হিল স্টেশন ইত্যাদি। সাম্রাজ্যবাদী জনস্বাস্থ্যের মূল কথাই ছিল জাতি বৈষম্যকে বাঁচিয়ে রাখা। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদীর রাষ্ট্রের নীতি ছিল 'মিনিমালিস্ট'। রাষ্ট্রশক্তির নিজস্ব বাঁচার প্রয়োজনে ন্যূনতম যা করার ছিল তা-ই তারা করতেন। সময়ের পরিবর্তনে যেখানে তাদের নিজের দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নত হয়েছিল, সেখানে উপনিবেশগুলোতে তা অবনমিত হতে থাকে। ম্যালেরিয়া, প্লেগ এবং কলেরা ইংল্যান্ড থেকে যথাক্রমে ১৮৬৪, ১৮৪১ এবং ১৮৬৬ সালে কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়, অথচ তাদের উপনিবেশগুলো এসব রোগের তীব্রতার দুর্ভোগ বহুদিন ধরে ভোগ করতে থাকে। তবে একথাও সত্য, উপনিবেশিক সরকার ভারতবর্ষে মহামারি নিয়ন্ত্রণে যা পরিকল্পনা করেছে এবং যা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে, তার অনেকাংশই ভারতবাসীদের অসহযোগিতা, অসচেতনা ও কুসংস্কারচ্ছন্নতার কারণে সম্ভব হয়নি।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১ W W. Hunter, *A Statistical Account of Assam,* Vol. I., (London: Trubner & Co., 1879), 95.

২ J. Westland, *A Report on the District of Jessore: It's Antiquities, Its History, and Its Commerce,* (Calcutta: Bengal Secretariat Office, 1871), 178-181.

৩ *প্রাগুক্ত*, ১৮১।

৪ শ্রী সাক্ষরাম গণেশ দেউসকর, *দেশের কথা* (বাংলায়), প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: মেটকাফ প্রেস, ১৯০৬), ১৫৪-১৫৫।

৫ *Report on the Administration of Bengal 1871-72,* (Calcutta: Bengal Secretariat Press, (1872), 6.

৬ W W. Hunter, *op.cit.,* Vol. IV, 438.

৭ *সংবাদ প্রভাকর*, ১৪ই শ্রাবণ ১২৬৫ বঙ্গাব্দ, বিনয় ঘোষ (সম্পা.), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (বাংলায়), প্রথম খণ্ড, (কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬০), ২৪০-২৪১।

৮ W W. Hunter, *op.cit.,* Vol. III, 123.

৯ W W. Hunter, *op.cit.,* Vol. IV, 247-248.

১০ Muhammad Umair Mushtaq, *"Public Health in British India: A Brief Account of the History of Medical Services and Disease Prevention in Colonial India," Indian Journal of Community Medicine*, Vol. 34 (January 2009). *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2763662/*. (Accessed; May 2, 2024).

১১ *বাংলায় মহামারির একাল ও সেকাল*, *https://is.gd/HY7EwF*. (Accessed; May 2, 2024.)

১২ D. R. Varma, *Medicine, Healthcare and the Raj: The Unknown Legacy*, (1st ed.), (Gurgaon: Three Essays Collective, 2015), 95-96.

১৩ K. Ray, *History of Public Health: Colonial Bengal, 1921-1947*, (1st ed.), (Kolkata: K.p. Bagchi& Co, 1998), 58-60.

১৪ J. Westland, *A Report on the District of Jessore: It's Antiquities, Its History, and Its Commerce*, (Calcutta: Bengal Secretariat Office, 1871), 179.

১৫ J H E. Garrett, *Bengal District Gazetteers: Nadia*, (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1910), 63.

১৬ Frederick Corbyn, *A Treatise on the Epidemic Cholera as it has prevailed in India*, (Calcutta: Baptist Mission Press, 1832), 5.

১৭ J. Westland, *op.cit.*, 180.

১৮ C. Palit, & AK. Dutta, (Ed.), *History of Medicine in India: The Medical Encounter*, (1st ed.), (Delhi: Kalpaz Publicatios, 2005), 59-60.

১৯ James Jameson, *Report on the Epidemic Cholera Morbus*, as it visited the territories *subject to the Presidency of Bengal, in the Years 1817, 1818, and 1819*, (Calcutta: Government Gazette Press, 1820), 170.

২০ W W. Hunter, *op.cit.*, Vol. II, 335.

২১ L S S. O Malley, *Bengal District Gazetteers: Jessore*, (Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1912), 65.

২২ Lt.-Col D.G. Crawford, *Hughli Medical Gazetteer*, (Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1903), 474.

২৩ *প্রাগুক্ত*, ৪৭৩।

২৪ W W. Hunter, *op.cit.*, Vol. I, 166.

২৫ H W. Bellow, *The History of Cholera in India from 1862 to 1881: Being a Descriptive and Statistical Account of the Disease*, (London: Trubner & Co., 1885), 199.

২৬ *সমাচার দর্পণ*, তারিখঃ ২১ মার্চ, ১৮৪০, শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংবাদপত্র শেকালের কথা* (বাংলায়), দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (কলকাতাঃ ১৪০১ বঙ্গাব্দ), ৪১১।

২৭ K. Ray, *op.cit.*,73-74.

২৮ *প্রাগুক্ত*, ৮৫-৯২।

২৯ *প্রাগুক্ত*, ৯৬-৯৭।

৩০ *বাংলায় মহামারির একাল ও সেকাল, https://tinyurl.com/ypk7cpmc* (Accessed; June, 10, 2024).

৩১ *বাংলায় মহামারির একাল ও সেকাল*, *প্রাগুক্ত।*

৩২ Muhammad Umair Mushtaq, *"Public Health in British India: A Brief Account of the History of Medical Services and Disease Prevention in Colonial India," Indian Journal of Community Medicine,* Vol. 34 (January 2009), (Accessed; June, 10, 2024.), *https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2763662/*

৩৩ *প্রাগুক্ত।*

৩৪ *প্রাগুক্ত।*

৩৫ Anil Kumar, *Medicine and the Raj: British medical policy in India, 1835-1911*, (New Delhi: SAGE Publication), 196.

৩৬ Shaurya Gupta & Yashika Ahuja, *International Journal of Law Management & Humanities,* Vol.III, Iss IV, 183. *Sweeping an Old Clock-Evaluation of Epidemic Diseases Act, 1897, 184.*

৩৭ *প্রাগুক্ত*, ১৮৪-১৮৫।

৩৮ Sandhya L. Polu, *Infectious Disease in India, 1892–1940 Policy-Making and the Perception of Risk,* (UK, Palgrave Macmillan, 2012), 43-44.

৩৯ *https://tinyurl.com/ypk7cpmc* (Accessed; June, 15, 2024.)

৪০ David Arnold, *Colonizing the Body: State Medicine and Epidemic Disease in Nineteenth-century India*, (California: University of California Press, 1993), 95,

৪১ Peter Robb ed. *Rural India: Land. Power and Society under British Rule*, (Delhi: Curzon Press, 1986), 216-43.